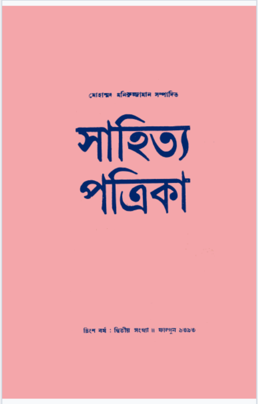

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা — পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	August 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v30i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.8
Pages	179-193
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

"স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারী জাতি অপর জাতির সাহায্য নির্ভর করে। তাই ব[illegible] পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন-না-কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না।"

Check for updates

মোতাহার হোসেন সুফী বেগম রোকেয়ার সাহিত্য বিভিন্ন কৌণিক-বিন্দু থেকে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের রচনাকাল, প্রকাশকাল এবং বিষয়বস্তু আলোচনার সময় বিস্তৃত উদ্ধৃতি, পক্ষ ও বিপক্ষদলের সমালোচনা উদ্ধৃত করায় পাঠকের কাছে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

'বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য' রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ। লেখকের শ্রম ও সাধনা রোকেয়া-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে নির্দেশে সক্ষম হয়েছে---এ মন্তব্য অনায়াসে করা যায়। গ্রন্থের সুরুচিপূর্ণ মুদ্রণ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য প্রকাশক বিশেষ ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটি সর্বসাধারণ্যে আদৃত হবে বলে আমাদের ধারণা।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা : আবুল কাশেম চৌধুরী ॥ প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ॥ পৃষ্ঠা ১২+৩৫২ ॥ মূল্য : চল্লিশ টাকা ॥

অবসন্ন মধ্যযুগ এবং অঙ্কুরিত নবযুগবৈশিষ্ট্যের সংরক্ত মিথস্ক্রিয়ায় প্রথমার্দ্ধ-উনিশশতকের বাঙালী-সমাজ অর্জন করেছে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ প্রাণাবেগ ও প্রগতিশীল সঞ্চারণ-ধর্ম। কোন যুগের অবক্ষয় যেমন সে-যুগের জন্য বেদনাময় পরাভব, তেমনি নবযুগের অভ্যুদয় নবীন যুগমানসের জন্য এক আনন্দময় প্রাপ্তি ও পরিতুষ্টি। যুগ ও যুগচেতনা যেহেতু একটি সমাজের বিমূর্ত অবকাঠামো----সেহেতু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

পূর্বতন যুগচেতনা নিঃশেষিত হয়ে যায় না ; অন্ধ-প্রেতাত্মার মত তার অবশেষ নবযুগের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই যুগের ঘাত-প্রতিঘাতই পরিণামে উদ্ভিন্ন নবযুগকে দান করে গতিধর্ম-আবেগধর্ম —যার অনিবার্য প্রতিফল সমাজের প্রগতিশীল অভিযাত্রা।

উনিশ শতকের প্রারম্ভকালে বাংলাদেশে নবযুগের যে অভ্যুদয় তার পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে পূর্বতন যুগের অবক্ষয় এবং অবক্ষয়িত সমাজের সুবিধাভোগী-শ্রেণীর ব্যর্থতা ও বেদনার ইতিহাস। সূচিত নবযুগে এই সামন্ত-সুবিধাভোগীর কেউ হয়েছে ক্ষয়প্রাপ্ত, কেউ-বা হয়েছে শ্রেণীচ্যুত, কিম্বা নবীন-সমাজের অভ্যন্তরে কেউ অনুসরণ করেছে আত্মগোপনের পথ। আবার ব্যর্থতাজাত বেদনার যন্ত্রণাময় প্রতিক্রিয়ায় কেউ আশ্রয় গ্রহণ করেছে রক্ষণশীলতার অচলায়তন দুর্গে। আধুনিক-যুগের নবজাতক চৈতন্য আর অচলায়তন রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বন্দ্বমুখর ঘাত-অভিঘাত সে-সমাজকে দিয়েছে প্রাণস্পন্দ। সময়ের এই ক্রান্তি-সংক্রান্তি যুগপৎ অঙ্গীকার করেছে আলোক ও অন্ধকার। নবমূল্যায়ন, পুনর্বিবেচনাবোধ, ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন, জ্ঞানানুশীলন, ঐতিহ্যচেতনা ও দেশানুরাগ, ঐ সন্ধিকালের আলোকস্তম্ভ ; রুচিবিকার, বরাঙ্গনাগমন, স্ফীত-অর্থের অপচয়, জাত্যভিমান, সংস্কার-অন্ধত্ব এবং পরিবর্তন-বিমুখতা তার অন্ধকার-জগৎ।

সমাজ-পটভূমির এই ভাব ও বস্তুগত সত্যকে অঙ্গীকার করেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাসাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা রচনার প্রয়াস এবং ক্রমান্বয়ে তার প্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা: পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮২০ থেকে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিধিতে রচিত ঐ-ধারার সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর এই রচনা ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য লিখিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ।

'Sociology of Literature' বা সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে রচিত এ-গ্রন্থে পূর্বাপর রক্ষিত হয়েছে গবেষকের বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ। গ্রন্থখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত; আলোচিত বিষয়ের বিন্যাস নিম্নরূপ: প্রথম অধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা:

প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় অধ্যায়--সামাজিক নক্শার পটভূমি, তৃতীয় অধ্যায়—রক্ষণশীল পরিবেশ: সামাজিক নক্শার সম্ভাবনা, চতুর্থ অধ্যায়—রক্ষণশীল পরিবেশ ও নক্শার প্রতিষ্ঠা: ভবানীচরণের যুগ এবং পঞ্চম অধ্যায়----সামাজিক নক্শার প্রতিষ্ঠা-পর্ব: উপসংহার। গ্রন্থকার তাঁর অবলম্বিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে 'পূর্ব-কথা' শিরোনামায় গ্রন্থারম্ভে উল্লেখ করেছেন যে---"সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পর্বটি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক-যুগে উৎক্রান্তির কাল, তাই সেখানে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ তুলনামূলকভাবে অধিকতর নিবিড়। এই কারণেই সাহিত্যের সমাজ-তাত্ত্বিক আলোচনাই অধিক ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা।...গবেষণাকর্মে আমি সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং সাধ্যমত জ্ঞাতি শাস্ত্রসমূহের সদ্ব্যবহার করবার প্রয়াস পেয়েছি সেই উদ্দেশ্যেই।"

'প্রস্তাবনা' অধ্যায়ে অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে তাঁর গৃহীত প্রত্যয় ও পদ্ধতির রূপ-রেখা উপস্থাপন করেছেন। যদিও এই উপস্থাপনা বিদ্যায়তনিক অভি-সন্দর্ভের ছকবাঁধা অনুশাসনে গ্রথিত——তবু এ-অধ্যায়ে মনোনিবেশ করলে গ্রন্থের চারিত্র ও গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় ধারণা লাভ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সুশীলকুমার দে[১] ও সুকুমার সেন[২] এবং আবু হেনা মোস্তফা কামাল[৩] প্রমুখ বর্তমান-ধারার সাহিত্যকে ইতঃপূর্বে ব্যঙ্গ, নক্শা বা নক্শা জাতীয় রচনা ব'লে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থকারের বিবেচনায় সামাজিক নক্শার সংজ্ঞার্থ হল:

> সামাজিক নক্শা সাহিত্য হিসেবে অপরিণত, অন্ততঃ সূচনাতে; তাই নক্শা শব্দের প্রাথমিক অভিধাই আমাদের অধিকতর কাম্য। অর্থাৎ চৌহদ্দি নির্দেশক রেখাচিত্র। সমসাময়িক সমাজে বহিরঙ্গ নির্দেশক রেখা-চিত্র অঙ্কনের যে প্রয়াস সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করি উনিশ শতকের গোড়ায়, তাকেই আমরা বলেছি সামাজিক নক্শা। (পৃ. ৫)

সামাজিক নক্শার সংজ্ঞার্থ-নির্দেশক আলোচনার শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে---"জীবনে যখন গভীর ভাবের, মহৎ আদর্শের দ্যোতনা থাকে না, তখন মানুষের সৃষ্টিতেও গভীরতা প্রত্যাশা করা

যায় না। বিস্মৃত ঐতিহ্যের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার যখন পশ্চাতে, সম্মুখে শূন্যগর্ভ ভবিষ্যৎ——জীবনের ত্রিশঙ্কু ও ত্রিভঙ্গমূর্তির বর্তমানতাই তখন একমাত্র অবলম্বন। এই পশ্চাৎভূমিই সামাজিক নক্‌শার লালনক্ষেত্র। ...উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার নগরজীবনে যে পরস্পর বিপরীতমুখী স্রোতের আবর্ত জেগেছিলো তারই বহিরঙ্গের রূপকার হচ্ছে আমাদের বাংলা সাহিত্যের সামাজিক নক্‌শা” (পৃ. ১৪-১৫)। গ্রন্থকার ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচারদর্পণ' (১৮১৮ খ্রী.) পত্রিকায় প্রকাশিত নক্‌শাজাতীয় মৌলিক রচনার কালকে সামাজিক নক্‌শার উদ্ভবকাল এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৩০-৭০) 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-কে (১৮৬৪) এই ধারার সাহিত্যের পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু তাঁর অন্বেষণের বিষয় এই ধারার সাহিত্যের প্রবর্তক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) যুগ, সে-কারণে নক্‌শার উদ্ভবকাল থেকে ভবানীচরণের মৃত্যুসাল পর্যন্ত কালপরিধি তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র। ঐ সময়কালকে (১৮২০-৪৮) তিনি সামাজিক নক্‌শার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামা 'সামাজিক নক্‌শার পটভূমি'। এ-অধ্যায়ে যুক্তি ও প্রমাণ পরম্পরায় বিশ্লেষিত হয়েছে সামাজিক নক্‌শা রচনার সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিকক্ষমতা-দখল, সামাজিক অন্তর্কাঠামোর পরিবর্তন-প্রক্রিয়া এবং অবকাঠামোগত রূপান্তর——বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য-বস্তু। গবেষক 'প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সমাজবিবর্তনের ভ্রূণাবস্থা'র সূত্র ধ'রে পলাশী-যুদ্ধোত্তর-কালের ঐ-পরিবর্তন-প্রক্রিয়াকে 'অবাধ লুণ্ঠন ও ভূমি-নির্ভর অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তন', 'নাগরিক সমাজের ক্রমবিকাশ ও কলকাতার সাহেব পাড়া', 'কলকাতার বাবু সম্প্রদায়', 'বাবু সমাজে সাংস্কৃতিক পরিবেশ' শীর্ষক পাঁচটি উপ-অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, কোম্পানী-শাসনের সূচনার তাৎপর্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে সীমিত নয়--কুক্ষিগত এই শাসনধারা "অঙ্গুলি সংকেত করে জনস্বার্থের পরিপন্থী যুক্তিহীন নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের দিকে" (পৃ. ৩৯)। যদিও অন্যত্র তিনি অন্ত্য-মধ্যযুগ সম্পর্কে অচঞ্চল, স্থবির, নিদ্রামগ্ন প্রভৃতি স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা ধারণাকে যুক্তি-যুক্ত মনে করেননি। তাঁর বিশ্বাস, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেই বাঙালী-সমাজে

বিবর্তনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিল (পৃ. ৪৯)। তাঁর এই মূল্যায়নে দ্বিমতের অবকাশ থাকা অসম্ভব নয়। অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরীর বিবেচনায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) মুঘল সামন্ত-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামন্ত-অর্থনীতিরই নবরূপ। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র 'ইংরেজদের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায়' (পৃ.৫৭) লাভ করেছে পুনর্জীবন। এই বিবেচনাবোধ থেকে তিনি যে প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তা-হল :

> ক্ষীয়মান সামন্তশক্তি কবলিত বিশৃঙ্খল সমাজে যে উদীয়মান ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভ্রূণাবস্থা দেখা দিয়েছিলো তার সকল সম্ভাবনাকে বিপর্যস্ত এবং সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনকে স্তম্ভিত করে দেয় কোম্পানির শাসন। তারই পূর্ণতর পরিণতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। (পৃ. ৫৮)

অতঃপর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর কলকাতার সমাজ-জীবনের যে পট-পরিবর্তন তা প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন সমাজের নবতর নাগরিক সংস্করণ। তাঁর মতে নব্য সামন্ত-ব্যবস্থার এই নাগরিক বৈশিষ্ট্যই তৈরী করেছে সামাজিক নক্‌শা রচনার তাৎপর্যপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত। সমাজের এই নাগরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যাঁরা রেনেসাসেঁর প্রাণধর্ম প্রত্যক্ষ করেছেন, অধ্যাপক চৌধুরী তাঁদের সে দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করেছেন; তাঁর ভাষায়—"···প্রাগুক্ত ঘটনাবলীর দেশজ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্ভাবন ঘটেছিলো তা রেনেসাঁস প্রবুদ্ধ নয়, বরং ক্লেদাক্ত বাবু সমাজ, বাবু কালচার এবং সামাজিক নক্‌শা তার অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি।" (পৃ. ৭০)

মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০)-এর মৃত্যুকাল থেকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক আবির্ভাবের পূর্ব-পর্যন্ত কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যে সূচিত হয়েছিল কবিগান, যাত্রা ও পাঁচালীর যুগ। কলকাতার নবোদ্ভূত নাগরিক-জীবনের 'কল্লোল ও উল্লাস', বৈভব ও বিকার এ-ধারার সাহিত্যে প্রতিফলিত। বর্তমান গ্রন্থকার সামাজিক নক্‌শার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সাহিত্যধারা হিসেবে 'কবিগান'-এর গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত

হঠাৎ-বাবু বা জমিদাররাই এই সাহিত্যধারার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রসগ্রাহক। কবিওয়ালাদের রচনায় অভিজাত সামন্তশ্রেণীর ক্রমঅবক্ষয় আভাসিত হয়েছে এবং যুগের এই মৌলিক পরিবর্তনশীলতা-কে আত্মস্থ করেই কবিওয়ালারা ভবিষ্যৎ সামাজিক-নক্‌শাকারদের সাহিত্য রচনার পটভূমি উন্মোচন করেছেন।

অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী 'সামাজিক নক্‌শার সম্ভাবনা' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শিল্পধারার উন্মেষ-রহস্য, উপান্ত-উৎস এবং সাময়িক পত্রে এর আত্মপ্রকাশের স্বনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন উপস্থাপন। তাঁর এ-ব্যাখ্যা হয়তো লাভ করবে না সর্বজন-গ্রাহ্যতা, তবু একথা বলা যায় যে—তাঁর জটিলতামুক্ত লক্ষ্যাভিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সত্যসন্ধ গবেষককে দেবে নতুন ভাবনার উপকরণ। তিনি মনে করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালের সমাজজীবন 'অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা' সংলগ্ন—সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এই দ্বিবিধ প্রবণতা সুপ্রত্যক্ষ। একদিকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক মূল্যমানের ক্রমক্ষয়, অন্যদিকে নতুন মূল্যবোধের উদ্ভাসন—এ-দুয়ের মধ্যে বলদর্পী ইংরাজ রাজশক্তির অভ্যুদয় এই সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কটকে করেছে প্রসারিত। তাই "নতুন জীবনে ধর্ম আছে, নেই আধ্যাত্মিকতা। বিত্ত আছে, কিন্তু নেই তার প্রতিষ্ঠা। বর্তমান আছে, অথচ ভবিষ্যৎ সংশয়ে বিম্বিত: তার জীবন পরিকীর্ণ অসঙ্গতিতে" (পৃ. ১২৬)। গ্রন্থকার এই সামাজিক অসঙ্গতির ও দ্বন্দ্বময় বাস্তবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন সামন্ত রক্ষণশীলতা আর নবজাত উদারনীতির সংঘাত। তিনি এই দ্বন্দ্বকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব হিসেবে স্বীকার করেননি; তাঁর মতে এই সংঘাত রাজানুকূল্যে দ্বিতীয় শক্তিরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য 'সমশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ বিবাদ'। কিন্তু উল্লিখিত আলোচনার অব্যবহিত-পরেই তিনি লিখেছেন: "এই দ্বন্দ্ব বিরোধের প্রকৃতি বা কারণ নির্ণয় কষ্টসাধ্য, কেননা তা বেশ জটিল, সূক্ষ্ম ও মিশ্র জাতের। পুরাতন সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্থলে নতুন দেওয়ান মুৎসুদ্দীগণ প্রতিষ্ঠা পেলো, কিন্তু নতুনতর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে। রক্ষণশীল প্রাচীন শক্তিকে যাঁরা পর্যুদস্ত করলেন তাঁদেরকেই আবার দেখছি রক্ষণশীল চরিত্রের অসংখ্য প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলতে" (পৃ. ১২৮)। সামাজিক নক্‌শার শ্রেষ্ঠ রূপ-কার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রক্ষণশীল দুর্গের প্রধান সেনাপতি

এবং প্রাচীনপন্থীদের মুখপত্র 'সমাচারচন্দ্রিকা'র (১৮২২) প্রকাশক। ভবানীচরণ এই সাহিত্যধারার প্রধান শিল্পী; কিন্তু তাঁর হাতে এই সাহিত্য-ধারার উদ্ভব হয়নি---তাঁর বেশ পূর্বেই এর সূচনা ও উজ্জ্বল সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিত হয়েছে রচিত। গ্রন্থকার সামাজিক নক্‌শার সূচনা ও সম্ভাবনার পর্যায়ক্রমিক আলোচনাকে বিন্যাস করেছেন তিনটি স্তরে---ক. অন্ধকার পর্যায়, খ. নক্‌শার উপকরণ এবং গ. সাময়িকপত্রের পর্যায়। এই তিনটি পর্বের ক্রমান্বয়িক পরিণাম---স্বাধীন গ্রন্থ-রচনা; 'ভবানী-চরণের যুগ' শিরোনামায় পরবর্তী অধ্যায়ে সামাজিক নক্‌শার প্রতিষ্ঠা প্রমাণে সে-আলোচনা বিন্যস্ত।

মধ্যযুগের অবসান এবং সামাজিক নক্‌শার প্রতিষ্ঠা-পূর্ব কালসীমাকে গ্রন্থকার আবুল কাশেম চৌধুরী 'অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর অনুমান এই 'অন্ধকার যুগে'ই সামাজিক নক্‌শার সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল। এই আলোচনায় গ্রন্থকার কিছুটা দ্বিধাজড়িত, স্ববিরোধ-আক্রান্ত এবং কল্পনা-আশ্রয়ী। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

> সাহিত্য সংস্কৃতিতে অন্ধকারযুগ বলে কিছু থাকে না, থাকতে পারে না। আমাদের ইতিহাসবোধ, জ্ঞানের পরিধি যেখানে খণ্ডিত, অন্ধকারের সূচনা সেই সীমান্তে। সেই অর্থেই নক্‌শার ইতিহাসে একটা অন্ধকার যুগ আমরা কল্পনা করেছি। 'সমাচারদর্পণ'-এর পৃষ্ঠায় নক্‌শা জাতীয় কিছু গদ্য-পদ্য-সঙ্গীত রচিত হয়ে থাকবে, হয়তো মুখে মুখেই ফিরছিলো সেগুলি একদিন। যার অস্তিত্ব ছিলো বলে আমাদের বিশ্বাস, অথচ যার সন্ধান আমরা পাইনি---সম্ভবত পাওয়ার আশাও তেমন নেই---তার কালপরিধিকেই আমরা নক্‌শার অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করতে অভিলাষী। (পৃ. ১৩১)

তিনি এই অন্ধকার-পর্যায়কে---ক. ছড়া-প্রবচন-উপাখ্যান; খ. লৌকিক ধারার ব্যঙ্গ রচনা; গ. নাগরিক ব্যঙ্গকার রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং ঘ. সমাজ-সমালোচক সঙ সমাচার---এই চরটি উপ-বিভাগে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে উল্লিখিত চারটি পর্যায়ে সামাজিক নক্‌শার সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল।

গ্রন্থকার 'বাবু-কালচার'-কে সামাজিক নক্‌শার প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে নক্‌শার পরিবেশ হল 'বাবু-কালচার' আর এই 'বাবু-কালচারের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি'ই হচ্ছে 'সামাজিক নক্‌শা'।

সামাজিক নক্‌শার উদ্ভবে সাময়িক পত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার প্রথমেই মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের ঐতিহাসিক মূল্যের পুনর্বিবেচনা ক'রে[8] সাহিত্যক্ষেত্রে যন্ত্রের তুলনায় মানবিক উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়----তাঁর এ-বক্তব্য সর্বাংশে প্রাসঙ্গিক নয়। সাময়িকপত্রে সামাজিক নক্‌শা রচনার সম্ভাবনা যদি সূচিত হয়ে থাকে তাহলে সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশের বাস্তবিক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের সমধিক তাৎপর্য অনায়াস-বোধ্য।

বলা আবশ্যক, নবযুগের সম্ভাবনা সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল----দুই প্রান্তবর্তী শ্রেণীর তর্ক-বিতর্কময় এই পরস্পর-বিরোধিতার সাহিত্যিক প্রকাশ সাময়িক পত্রকে করেছিল আশ্রয়। এবং ক্রমান্বয়ে এই সাময়িক-পত্রই ধারণ করেছিল সামাজিক নক্‌শা জাতীয় রচনার সম্ভাবনার ইতিহাস। খ্রীস্টান মিশনারীদের 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮), প্রগতিপন্থীদের 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' (১৮১৮) এবং রক্ষণশীলদের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) উল্লিখিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য দলিল। গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, "সম্বাদ কৌমুদী এবং প্রথম দিকের সমাচার চন্দ্রিকার কোন নিদর্শন আমরা পাই না, অপরাপর পত্রিকায় তাদের কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। সেইহেতু এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রথম দিকের সাহিত্যে সম্ভাবনাযুক্ত সকল রচনা আমাদের হস্তগত হয়নি (পৃ. ১৬৭)।" তবু তিনি প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে সামাজিক নক্‌শার সম্ভাবনাযুক্ত রচনার শ্রেণীবিন্যাস ক'রে এর ঐতিহাসিক মূল্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিবেচনায় এ-সব রচনার শ্রেণীপরিচয় নিম্নরূপ : ক. প্রচলিত সরস উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি; খ. আখ্যানজাতীয় নক্‌শা; এবং গ. সংবাদ বা পত্র-জাতীয় রচনা। এ-অধ্যায়ের প্রমাণসাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা স্থাপন করেছে পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশের বাস্তব ভিত্তি।

'রক্ষণশীল পরিবেশ ও নক্‌শার প্রতিষ্ঠা : ভবানীচরণের যুগ' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে সমাজ-পরিবেশগত আলোচনার প্রেক্ষাপটে নক্‌শাকার হিসেবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও পরিবেশ-পরিচিতি এবং তাঁর মানস-পরিমণ্ডল ও রচনা-পরিচয় হয়েছে উপস্থাপিত। সামাজিক নক্‌শা রচনার প্রতিষ্ঠাকালের একক অধীশ্বর ভবানীচরণ; গ্রন্থকার এই কালসীমাকে (১৮২০-৪৮) চিহ্নিত করেছেন 'ভবানীচরণের যুগ' শিরোনামায়। 'সামন্ত পরিবেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির' সঙ্গে কলকাতার নাগরিক-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত-জাত যে মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হল ---সে-সংস্কৃতির অন্যতম ভাষ্যকার ও প্রতিনিধি হিসেবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করেছেন গ্রন্থকার। তাঁর ভাষায়---"উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতার সমাজ-জীবনে অর্ধ-শিক্ষিত উচ্চ-বিত্তের মধ্যে ক্ষীয়মাণ সামন্ত সংস্কৃতি ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা যে আত্মবিধ্বংসী প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলো, ভবানীচরণ তারই রূপকার। তিনি ছিলেন তৎকালে প্রধানত সাংবাদিক, তার কারণে প্রত্যক্ষ বর্তমানই ছিলো তাঁর উপজীব্য এবং একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চিত্তবৃত্তিকে শাসন করেছে ব'লে উদ্দেশ্যপ্রবণতা ছিল তাঁর সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য পাশাপাশি বিদ্যমান বিধায় উদ্দেশ্যপ্রবণ সৃষ্টির নানা পর্যায়ে শিল্পধন্য ব্যঞ্জনার প্রচ্ছায়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না (পৃ. ২০৯)।" কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই গ্রন্থকার লিখেছেন যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার ভগ্ন-অংশ মাত্র শিল্প-নির্মাণে ব্যাপ্ত এবং তাঁর সংরক্ষণশীল মনোভাবের সংকীর্ণ সরণী যে-লক্ষ্যের অভি-মুখী-----সেখানে শিল্পসম্ভাবনা তিরোহিত। বলা বাহুল্য, উচ্চমানের গবেষণাগ্রন্থে এ-ধরনের স্ববিরোধ অনাকাঙ্ক্ষিত।

গ্রন্থকার পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে ভবানীচরণের মানসপরিমণ্ডল ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনাসমূহের শ্রেণীকরণকৃত তালিকা। অতঃপর পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন সামাজিক নক্‌শা জাতীয় রচনার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত সামাজিক নক্‌শার নিদর্শনরূপে আলোচ্যগ্রন্থে উদ্ধারকৃত রচনার তালিকা নিম্নরূপ: ক. কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), খ. নববাবুবিলাস (১৮২৫), গ. দূতীবিলাস (১৮২৫) এবং ঘ. নববিবিবিলাস (১৮৩১)। 'সমাচার দর্পণে-প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান'

দু'টির রচয়িতা অজ্ঞাত-নামা হলেও রচনাসাদৃশ্যগত কারণের জন্য সমালোচকেরা ভবানীচরণকেই এর রচনাকারের সম্মান প্রদান করেছেন।[৫]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা জাতীয় রচনাধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ; ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি সমকালীন সমাজজীবনের বস্তুনিষ্ঠ দর্পণ-রূপেও এর গুরুত্ব অসীম। এ-গ্রন্থের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "কলিকাতা কমলালয়ে যে জীবনের চিত্র উৎকীর্ণ----তা এক কথায় সন্ধিযুগের লক্ষণাক্রান্ত। নতুন ও পুরাতনের টানাপোড়েনে আন্দোলিত ভবানীচরণ সেই সন্ধিযুগের জীবন-ভাবনারই প্রথম রূপকার।"[৬] আবুল কাশেম চৌধুরী তাই এই গ্রন্থালোচনায় সাহিত্যমূল্যের সম্পূরক হিসেবে সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ-কারণেই তিনি---- রচনার উদ্দেশ্য, সমাজবিন্যাসের রেখাচিত্র, লেখকের ভাষাদর্শ তথা ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা, লেখকের রক্ষণশীলতার স্বরূপ ও সীমানা-নির্দেশ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকজনিত মনোরঞ্জন----এই চারটি দিক-চিহ্নকে সামনে রেখে----'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন।

গ্রন্থকার ভবানীচরণের অভিপ্রায়ের[৭] সূত্র ধ'রে লিখেছেন যে "কলকাতার জনসমৃদ্ধি ঘটেছে চারপাশের গ্রামীণ মানুষের আগমনে এবং প্রথম পদক্ষেপে পাশ্চাত্য প্রভাবজনিত নাগরিক অভিনবত্বে তারা যে সন্দিগ্ধ হবে তাও স্বাভাবিক। এই সন্দেহ ও সংশয় নিরসনকল্পে লেখকের আগ্রহ থেকেই গ্রন্থখানির উৎপত্তি।" তাঁর মতে এই গ্রামীণ আর নাগরিক মানুষ অভিন্ন ব্যক্তিত্বের দুই সত্তা----যা লেখক-মানসেরই ভিন্নরূপ। এবং এই দুই সত্তার পরস্পর-বিরোধিতার একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় উপনীত হয়ে রক্ষণশীল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার মানসেই 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থখানি পরিকল্পিত।

'কলিকাতা কমলালয়ে' সমাজের যে রেখাচিত্র বিধৃত তার পটভূমি রচিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রারম্ভকালীন ইংরাজদের বাণিজ্যবিস্তারের কেন্দ্রস্থল উন্নয়নশীল কলকাতা নগরীকে ভিত্তি ক'রে। এই নগরীর সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, তাদের পরস্পরের জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েন,

সাংস্কৃতিক অভিরুচি ও শিক্ষাজীবন উল্লিখিত সমাজ-রেখাচিত্রের কাঠামোকে করেছে সুদৃঢ়। 'কলিকাতা কমলালয়ে' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষাদর্শ সম্পর্কে পূর্বতন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন আবুল কাশেম চৌধুরী বিচার-সাপেক্ষে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। তবে ভবানী-চরণের রক্ষণশীল চরিত্রবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উন্মোচন এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবস্থান-নির্দেশে তিনি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক। তাঁর ভাষায়:

> বর্ণকৌলীন্যের অপকর্ষে সমাজ যখন অবক্ষয়ের শিকার, তখন তিনি সর্ববিধ অপসংস্কৃতির দায়িত্ব সদ্যার্জিত বিত্তশালী অকুলীনদের স্কন্ধে আরোপ করে নির্বিঘ্ন। কিন্তু সৃষ্টিপ্রবণ ভাষাদর্শ নির্মাণে গোঁড়ামী তাঁর কাছে কোন প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ, সংসাধিত পরিবর্তন স্বীকৃত। কিন্তু পরিবর্তনশীলতা তাঁর মান্য নয় বলে তা ভবিষ্যতের সম্পদরূপে বরণীয় নয় আদৌ। তাই তিনি প্রধানত সাংবাদিক এবং বর্তমানের শিল্পী,—ভবিষ্যতের রূপকার হবার বাসনা তাঁর চিত্তে কোন দোলা জাগায় না। তাঁর সৃষ্ট নক্‌শা তাই সাহিত্য হিসেবে বরণীয়, কিন্তু মহৎ শিল্পের প্রত্যাশা সেখানে ব্যর্থ। (পৃ. ২৩৬)

'নববাবুবিলাস' সম্পর্কে আলোচনায় গ্রন্থকার 'বিলাস' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বড়ুচণ্ডীদাসের নৌকা বিলাস, ভারতচন্দ্রের দূতীবিলাস প্রভৃতির উল্লেখ ক'রে একে ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন-রূপে চিহ্নিত করেছেন। যে-সব সমালোচক ইতঃপূর্বে 'নববাবুবিলাস'কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন, গ্রন্থকার তাঁদের মত বিচার ক'রে লিখেছেন যে, "সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও নববাবুর সমগ্র জীবন—অংকুর থেকে ফলখণ্ড পর্যন্ত—এই গ্রন্থে অংকিত, তথাপি তাতে উপন্যাসের অস্ফুট ভ্রূণাবস্থা মাত্র পাওয়া সম্ভব" (পৃ. ২৫৪)। কেননা "সমাজের অবক্ষয়ে নিবিষ্টচিত্ত বলে লেখক কোন সৎ, প্রাণবন্ত ও আত্মপ্রত্যয় সম্পৃক্ত চরিত্রের কথা ভাবেনই নি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখা-চিত্রের মাধ্যমে সমাজের চটা-ওঠা ধ্বসে-পড়া চত্বরটিই তিনি অঙ্কন করে চলেছেন।" (পৃ. ২৫৬)

অশ্লীলতা ও রুচিবিকারের অভিযোগে অভিযুক্ত 'দূতীবিলাস' গ্রন্থের নবমূল্যায়ন সামাজিক নক্‌শার প্রতিষ্ঠা-পর্বের আলোচনাকে করেছে

তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রকাশকালে গ্রন্থটির মুদ্রাকর-পৃষ্ঠায় স্পষ্টতই উল্লেখ-কৃত ছিল যে "...আদিরস ভক্তিরস ঘটিত দূতীবিলাস সুরসিক রসদায়ক পুস্তক।" কিন্তু অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী মুদ্রাকর উল্লেখিত এবং সমালোচক-সমর্থিত 'দূতীবিলাস' কাব্যের অশ্লীলতা-দোষ অস্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়। পদ্যের আঙ্গিকে গ্রথিত 'দূতী-বিলাস'-এ অভিব্যক্তি পেয়েছে পরকীয়া প্রেমের রুচিবিকৃতি ও পঙ্কিল কামনার আগ্রাসী স্বরূপ। কলকাতার পটভূমিতে স্থাপিত মফঃস্বলের জমিদার শ্রীদেব ও দ্বিচারিণী অনঙ্গের জীবনের যে-রেখাচিত্র এ-গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে তা লেখকের সমাজ-সচেতন মানসেরই ফল। এ-জন্যেই সম্ভবত 'দূতীবিলাস' গ্রন্থালোচনার উপসংহারে পূর্বে-ব্যক্ত অভিমত বিস্মৃত হ'য়ে গ্রন্থকার লিখেছেন: "সমাজ প্রসঙ্গের সচেতন প্রয়োগের ফলে শেষ পর্যন্ত তা নিম্নমানের পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য না হয়ে সামাজিক নক্‌শার অভিধা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই যোগ্যতাই ভবানীচরণের এক অভিনব শিল্পসত্তা।" (পৃ. ২৬৯)

বিষয় ও বিন্যাস এবং বস্তুনিষ্ঠ সমাজচিত্রাঙ্কণ-সূত্রে 'নববিবিবিলাস' তাৎপর্যমণ্ডিত। এক সময়ের বাবু-গিন্নী কিভাবে দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানি ধারণ ক'রে গৃহত্যাগী হয় এবং অবশেষে রূপোপজীবিনী-রূপে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ ক'রে 'নববিবি' নাম গ্রহণ করে----তারই রসঘন কাহিনী 'নববিবিবিলাস'। গ্রন্থকার যদিও প্রতিষ্ঠাপর্বের আলো-চনায় এ-ধারার সাহিত্যের সুদূর-চিহ্নিত প্রভাব-বলয়ের আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেননি, গ্রন্থারম্ভে এ-ধরনের প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন-নি----তবু একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও প্রকৃতিকতার যে-প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছে----সমাজের অনুপুঙ্খ বর্ণনায়, নিষিদ্ধ পল্লীর স্বরূপ উদ্ঘাটনে এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনবীক্ষায় তার বীজ সর্বপ্রথম ভবানীচরণের এই তিনটি গ্রন্থে রোপিত হয়েছিল। গ্রন্থকার অবশ্য 'ভবানীচরণের যুগ' অধ্যায়ের উপসংহারে এর একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়----"এই সব জীবন-সত্যের বিলম্বিত যৌগিক প্রতিফল স্বরূপ সামাজিক নক্‌শার এই প্রাথমিক স্তরে[?] আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুটো সত্যের সঞ্চার ঘটেছে: এক. মধ্যযুগের অপসৃয়মান প্রভাবের বিলম্বিত অবস্থান; এবং দুই. আধুনিক জীবন-সত্যের ক্রম-সম্প্রসার।" (পৃ. ২৮৯)

'সামাজিক নক্‌শার প্রতিষ্ঠা-পর্ব: উপসংহার' শীর্ষক পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ের সূচনায় গ্রন্থকার 'নববিবিবিলাস' এর সমসাময়িক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়--রচিত 'পারসিকিউটেড' (১৮৩১)-গ্রন্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরেজীতে লিখিত এ-গ্রন্থকে তিনি সামাজিক নক্‌শা নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এ-গ্রন্থে ইয়ংবেঙ্গল-কৃষ্ণমোহন রক্ষণশীলতার দুর্গে দুঃসাহসী আঘাত হেনেছেন---যা সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে আলোকিত করেছে (পৃ. ৩০১)। যদিও তিনি পরবর্তী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে ইয়ংবেঙ্গলের আবির্ভাব সমাজ-দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা সঞ্চারিত করলেও এই দ্বন্দ্বের মৌল চরিত্র ছিল অপরিবর্তিত। (পৃ. ৩০৩)

সমগ্র আলোচনার চুম্বকাংশ হিসেবে অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী 'উপসংহার' অধ্যায়ে যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সূত্রাকারে তার পরিচয় উপস্থাপিত হল :

ক. সামাজিক নক্‌শা রচনার প্রেরণাশক্তি-রূপে ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির তুলনায় দেশীয় ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত।

খ. উদারনৈতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করে ঐতিহ্যের সংরক্ষণই ছিল প্রতিষ্ঠা-পর্বে সামাজিক নক্‌শা রচনার উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্যের সহগামী হয়েছে প্রগতিভাবনাজাত সমাজসংস্কার-বাসনা।

গ. "সেকালের কলকাতার নষ্ট চরিত্রের সমাজ-বিধায়কগণ যত অপকীর্তিই করুন, তাঁরা আমাদের ঐতিহ্যের অংশীদার, পূর্বপুরুষ। তাঁদের উপেক্ষা বা অস্বীকার করলে আমাদের অস্তিত্ব শূন্যে মিলিয়ে যায়! তদ্রূপ, বর্তমানের সাহিত্য সামাজিক নক্‌শারই উত্তরসূরী। সেই সাহিত্য-প্রজাতিকে অশ্লীল বলে উপেক্ষার যে ঐতিহ্য তা বিভ্রান্তিকর। বাবু কালচারের প্রতিনিধি হলেও নক্‌শার রচয়িতা বাবুদের কেউ নন, তাঁদের অধীনস্থ লেখক মাত্র।" (পৃ. ৩০৮)

ঘ. "...সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও এক ধরনের mental তথা social catharsis যা সমাজ মানসের প্রশমন ঘটিয়ে তাকে সুস্থ, সচল ও সজীব রাখে। সামাজিক নক্‌শা সমসাময়িক

সমাজের ক্লেদজাত গ্লানিকে প্রশমিত করে এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে।...” (পৃ. ৩০৯)

ঙ. “সংস্কৃত-বিলাসী দুর্বোধ্য ভাষার বিরুদ্ধে নক্‌শার ভাষাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করতে হবে। ‘কলিকাতা কমলালয়’ থেকে ‘নববিবিবিলাস’ পর্যন্ত বা তারো পূর্ববর্তী সাময়িক পত্রের নক্‌শাধর্মী রচনাবলীর মধ্যে ভাষার যে ইডিওমেটিক ব্যবহার তাতে সমসাময়িক কালের প্রাকৃত জন-গোষ্ঠীর মুখের ভাষার স্বাদ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আলালীভাষা হুতোমী ভাষা, এমন কি রসিক চূড়ামণির ‘বুড়ো বক্কেশ্বরের গল্প’, ইত্যাদির ভাষা এই ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরী।” (পৃ. ৩১০-১১)

চ. “সনাতন, স্থির, স্থানু, গতিহীন সমাজ-প্রতিপালিত প্রাচ্য সাহিত্যে ট্র্যাজেডির অপ্রকাশ ছিলো খুবই স্বাভাবিক। কলকাতার সংকীর্ণ মানচিত্রে তার একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেলো বাবুদের জীবনে। বিত্ত এবং মর্যাদার প্রাচুর্য নিয়ে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রেখে, এই বাবু সম্প্রদায় পতঙ্গবৎ অগ্নির অভিমুখীন। তাই ‘বাবুর উপাখ্যান’ থেকে ‘নববিবিবিলাস’ পর্যন্ত সৃষ্টির সৌধ বিয়োগাত্মক পরিণতির সাক্ষী-স্বরূপ। ট্র্যাজেডির মহিমা তাতে নেই, নেই কোন সচেতন প্রয়াস, কিন্তু আছে তার অংকুরের পরিচর্যা।” (পৃ. ৩১২)

গ্রন্থ-পরিচয় উপস্থাপনা-সূত্রে এই প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে রচিত সামাজিক-নক্‌শাসমূহ রূপান্তরকামী সমাজ-সংস্কৃতির ক্রান্তিকালের রেখাচিত্র হয়েও কালের বিচারে সাহিত্যের সম্পদ-রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই সাহিত্যধারার বাস্তব পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা-পর্বের নৈয়ায়িক-শৃঙ্খলাযুক্ত সমাজতাত্ত্বিক-পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন বাংলা-দেশের সাহিত্যগবেষণার ইতিহাসে তার মূল্য অবশ্য-স্বীকার্য।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্র. Sushil Kumar De : Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857), second revised edition, Calcutta, 1962

২ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ষষ্ঠ সংস্করণ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ১৯৯-২০৯

৩ Abu Hena Mustafa Kamal: The Bengali Press and Literary Writing (1818-31), University Press Limited, Dhaka, 1977, See Pp. 49-75

৪ Ibid., Pp. 1-14.

৫ "সমাচার দর্পণে' মুদ্রিত দুটি 'বাবুর উপাখ্যানে'র লেখক অজ্ঞাত-নামা। কিন্তু অল্পকালের ব্যবধানে প্রকাশিত ভবানীচরণের রচনা-বলীর বিষয়বস্তু ও পরিচর্যার সঙ্গে 'বাবুর উপাখ্যানে'র সাদৃশ্য এতোই গভীর যে তাদের পিতৃত্ব অভিন্ন বলেই সমালোচকরা মনে করেন।" উদ্ধৃত; 'কলিকাতা কমলালয়: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়'; ভূমিকা, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫, পৃ. ৪

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৭ ভূমিকা: 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কলিকাতা কমলালয়'—"পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার-বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্য ন্যায় বসিয়া থাকেন...এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবৃত্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌-চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন অধিকন্তু কলিকাতা কমলালয় হইতে বৃত্তান্তরূপ অনেক রত্নলাভ হইতে পারিবেক..." পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

ভীষ্মদেব চৌধুরী